সঙ্গপ্রসঙ্গ

ভারতীপ্রাণামাতাজীর দুর্লভ স্মৃতি

প্রব্রাজিকা অম্বিকাপ্রাণা

[শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা পরম পূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর সঙ্গে আশ্রমিকদের সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড় ও মধুর। তাঁর স্নেহসান্নিধ্যের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র উপহার দিয়েছেন প্রবীণ সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা অম্বিকাপ্রাণা।—সঃ]

ভারতীপ্রাণামাতাজীর কথা বলতে গেলে শরৎ মহারাজের গাওয়া সেই গানটির কথাই মনে পড়ে—''রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।'' একই সঙ্গে মহাবীরের কথাটাও মনে পড়ে—''ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?''

মঠে আমরা সবাই তাঁকে 'মা' বলে ডাকতাম। আমি যখন প্রথম মঠে আসি (১৯৫৬ সাল), সেটা ছিল বৈশাখ মাস। আমার তো গঙ্গা দেখে খুব আনন্দ! পাড়ে বসে গঙ্গা দেখছি। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি একটা সাপ। হাতের কাছেই ইঁট ছিল, তাই নিয়ে ছুঁড়তে থাকি। আধমরা সাপটা মারা গেল। মায়ের কাছে খবর গেল—ত্রিচুর থেকে যে মেয়েটি এসেছে, সে একটা সাপ মেরেছে। শুনে মা বললেন, ''তোমরা তো টিকটিকি দেখলে ভয়ে পালাও। ও মেয়ে তো সাপ মারল গো! আমি তো এরকম মেয়েই চেয়েছিলাম।''

সন্ধ্যারতির পর প্রায় প্রতিদিনই আমরা মাকে প্রণাম করতাম। মা ভক্তের সংখ্যা বুঝে, ঠাকুরঘর থেকে উঠে এসে সিঁড়ির কাছে বসতেন। প্রথমে আমরা, পরে ভক্তেরা মাকে প্রণাম করতেন। প্রণাম করতে গেলেই মা এত সুন্দর করে 'এসো মা' বলতেন যে প্রত্যেকের মনে হত, মা বুঝি তাকেই বেশি ভালোবাসেন। একতলায় মিটসেফের ওপর একগ্লাস জল ও জলের ঢাকার ওপর একটা দানাদার থাকত; মা ওটা খেয়ে ওপরে গিয়ে জপে বসতেন। পূজনীয়া মার প্রতিদিনের রুটিন ছিল ঘড়ির সময়ে বাঁধা। ভোর তিনটে বা সাড়ে তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে জপে বসতেন। সকাল হলে জোয়ার-ভাঁটার সময় বুঝে বেশিরভাগ দিনই গঙ্গাস্নান করতেন। মঠের পুরোনো ঠাকুরঘরে ছোটো জায়গা। পুজোর জিনিস ছড়ানো থাকলে বলতেন, ''জান তো আমি এসময় ঠাকুর প্রণাম করতে আসি। এভাবে জিনিস ছড়িয়ে রেখেছ; যদি পায়ে লেগে যায়?'' মজা করে বলতেন, ''তবু আমি একচোখে দেখি। যদি দুচোখে দেখতাম, তবে তো তোমরা কত বকুনি খেতে!'' (গ্লোকোমায় মায়ের একটি চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।)

প্রতিদিন সকালে ঠাকুরের ফলকাটার কাজটি মা যতদিন পেরেছেন নিজের হাতে করেছেন। শিবের স্নানের ঘণ্টা পড়লে মাকে ডাকতে যেতে হত। দেখতাম মা তন্ময় হয়ে জপে ডুবে আছেন। ডাকতে সংকোচ হত। ডাকলে নিচু স্বরে বলতেন, ''যাচ্ছি চলো।'' ফলকাটার সময় কথা বলা পছন্দ করতেন না। নিজের মনে ঠাকুরের সহস্রনাম, মা কালীর ধ্যান, অপরাধভঞ্জনস্তোত্র ইত্যাদি আবৃত্তি করতেন। বিশেষ প্রয়োজনে ইশারা করতেন। ফলের থালা সাজানোর সুন্দর বিন্যাস ছিল—ঠাকুর কোন ফলের পর কোনটি খাবেন ঠিক সেইভাবে। ওইসময় হাঁটা-চলা বা বাসনের শব্দ হলে বলতেন, 'আস্তে বাবা'।

পুজোর ঘণ্টার শব্দ শুনে মা বলে দিতে পারতেন

কে পুজো করছে। একদিন আমি পুজো শেষ করে পুজোর জিনিসপত্র তোলার সময় আস্তে আস্তে স্তব পাঠ করছি। মা দরজার কাছ থেকে শুনে বললেন, ''এরকম রোজ করবে। শরৎ মহারাজ বলতেন, স্তবপাঠ করাটাও পুজোর একটা অঙ্গ।'' আমি বলি, ''মা, মাদ্রাজে স্বাহানন্দ মহারাজকে দেখেছি, পুজোর পর স্তবপাঠ করতে করতে পুজোর স্থান গোছাতেন। ওঁকে দেখে আমি তখন থেকেই স্তব মুখস্থ করি।''

ঠাকুরঘরে মা আমাদের শেখাতেন কীভাবে ফুলদানি করতে হয়। বেশি পাতা দেওয়া বা ফুলদানির পিছনে পাতা দিয়ে সামনে ফুল দেওয়া পছন্দ করতেন না। বলতেন, ''ফুলদানির চারপাশে ফুল দিতে হয়, যাতে ঠাকুরের দিকেও ফুল থাকে।'' পান সাজতে শেখানোর সময় প্রথমে মা শিউলিপাতা দিয়ে পান মোড়া অভ্যাস করাতেন। বেশি ধূপ জ্বালানো মা একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, ''ভক্তেরা কষ্ট করে ধূপ আনে। ব্যয়ের দিকে লক্ষ রাখবে।'' পুজো শেষ হলে মা ধূপ নিভিয়ে রাখতেন, আবার সেটা ব্যবহার করতেন। বলতেন, ''বেশি ধূপ জ্বালানো বিলাসিতা। দরকারের জন্য দিই ঠিকই। অকারণে বেশি ধূপ দেওয়ার তো দরকার নেই। বেশি ধূপ দিলে ঠাকুরের কষ্ট হয়।''

একদিন আমি ঠাকুরের পায়ে ফুল দিচ্ছি, মা দেখে বললেন, ''ফুল ঠাকুরের কোলেই দেবে, তবে ফুলের কাপড় একটু সামনের দিকে টেনে এনে দেবে যাতে ঠাকুরের গায়ে ফুল না লাগে।'' কাছেই একজন ব্রহ্মচারিণী ছিল। সে আমায় বুঝিয়ে বলল, না হলে ছবিতে ড্যাম্প লাগবে। একথা শুনতে পেয়েই মা বললেন, ''ছবি ছবি বলছ কেন? এখানে সাক্ষাৎ ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি কি এখন ছবি আছেন? তোমার এ কী কথা! ছায়া-কায়া সমান।''

তখন ইলেকট্রিক পাখা ছিল না, তাই গরমের দিনে আরতির পর কাজ শেষ করে ভোগের ব্যবস্থা করার আগে পর্যন্ত ঠাকুরকে হাওয়া করতাম হাতপাখা দিয়ে। একদিন মা দেখে বললেন, ''ঠাকুরকে তো ঠাণ্ডা করে দিলে গো! আমি যখন কাশীতে ছিলাম, গরমের দিনে ঠাকুরকে এইভাবে হাওয়া করতাম।''

মায়ের খাওয়া-দাওয়া খুব সাধারণ ও অল্প ছিল। সকালে ফলপ্রসাদ ও দুপুরে সকলের মতো খাবার। বিকেলে কিছুই নয়। সন্ধ্যারতির পর একটা দানাদার বা গুজিয়া, সেটারও ভাগ আমি পেতাম, যখন বিকেলে রান্না করতাম। মা নিচে এসে খাওয়ার সময় অর্ধেক খেয়ে বলতেন, ''জয়ন্তী, হাফ রইল। ঠাকুরের ভোগ তুলে এসে খেয়ো।'' বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতেন, ''কী আবার রান্না! তার ওপর আবার মায়ের প্রসাদি মিষ্টিতে ভাগ বসানো!'' রাত্রে খেতেন দুটো রুটি, প্রসাদি লুচি একটা, একটু পায়েস ও দুধ।

কখনও কখনও মা আমায় 'জয়ন্তী' বলে ডেকে সাড়া না পেলে বলতেন (চিৎকার করে) 'জয়ন্তি মঙ্গলা কালি ভদ্রকালি কপালিনি'। আমার সন্ন্যাস হওয়ার পর 'অম্বিকা' না বলে 'অম্বিকে' বলতেন। তখন ঠাকুরসেবা করি। মা মঠ থেকে কোথাও যাবার সময় বলতেন, ''অম্বিকে, ঠাকুর রইলেন, দেখো।'' একবার স্কুল থেকে লক্ষ্মীদি (শ্রদ্ধাপ্রাণাজী) গাড়ি পাঠিয়েছেন বেলা দুটোয়। মা স্কুলে বার্ষিক অনুষ্ঠান দেখতে যাবেন। আমায় বলতে ভুলে গেছেন। আড়াইটের সময় মা মণিকাকে (করুণাপ্রাণা) নিয়ে চলে যান। বিশ্রাম থেকে উঠে জানতে পেরে মায়ের ওপর আমার খুব অভিমান হল। ভজনের পর দেখতে পেলাম মা এসেছেন। কিন্তু মায়ের কাছে যাচ্ছিও না, কিছু বলছিও না। মা দেখি সিঁড়িতে বসে আছেন। আমায় ডেকে হাতে ব্যাগটা দিয়ে বললেন, ''ব্যাগটা রেখে এসো। আমার ওপর রাগ করেছ?'' বলি, ''হ্যাঁ, আপনি না বলে যেখানে সেখানে চলে যান!'' মা বুঝিয়ে বললেন, ''আমি আগে বলতে ভুলে গেছি। তাছাড়া আমি কি তোমায় না বলে কোথাও যাই?'' তখন সব অভিমান চলে গেল।

মায়ের সঙ্গে দুষ্টুমি করতেও ছাড়তাম না। মায়ের ঘরেও ধুনো দিতে গিয়ে খানিকটা সিঁড়িতে ওঠার পর হাঁক দিতাম, ''মা, কে আসছে?'' মাকে বলতে হবে, ''ধুনো দাসী আসছে।'' যতক্ষণ না বলবেন, ততক্ষণ বলতে থাকব—''মা, কে আসছে?'' মা যেই বলবেন, 'ধু-নো-দা-সী' (টেনে টেনে); তবে ওপরে যাব। না হলে এক পাও নড়তাম না।

আমরা যখন ঠাকুরঘর করেছি মা আমাদের শিখিয়েছেন, প্রথমে পাত্রে গঙ্গাজল নিয়ে বাসনগুলি

ধুয়ে নিয়ে তাতে গোটা ফল ধুতে যাতে গঙ্গাজল কম খরচ হয়। একদিন এক ব্রহ্মচারিণী ঠাকুরের বাসনগুলি ধুয়ে জল ফেলে দিয়ে ফল ধোয়ার জন্য নতুন করে পাত্রে গঙ্গাজল দেয়। মা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ''বাসন ধুয়ে জল ফেললে কেন? গঙ্গাজল কি কখনও অপবিত্র হয়? তাছাড়া তুমি তো গোটা ফল ধুচ্ছ। কাটা ফল তো নয়? অকারণে কাজ বাড়ানো ভালো নয়।''

ঠাকুর বা মায়ের তিথিপুজোর কার্ড প্রথম দিকে মা নিজেই বেলুড় মঠে দিতে যেতেন। সঙ্গে কেউ একজন থাকত। একবার আমাকে সঙ্গে নিলেন। মা পরম পূজনীয় মাধবানন্দজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আমি প্রণাম করতে মা মহারাজকে বললেন, ''মহারাজ, এ আপনাদের ওখানে জয়েন করা মেয়ে।'' মহারাজ তো খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতেন। সেই সুরেই বললেন, ''জানি জানি, ও সুরেশ মহারাজের (যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের) মেয়ে। তখন তো সারদা মঠ ছিল না। ব্যাকুল হয়েছিল দেখে টেম্পোরারি একটা চান্স দিয়েছিলাম। এখন আপনি বুঝুন আর আপনার মা বুঝুন। আপনার মা যেমন কলকাঠি নাড়বেন তেমনি হবে।'' মা হেসে বললেন, ''হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।''

যেসব ফল ঠাকুরকে দেওয়া যাবে না, আবার গরুকেও দেওয়ার দরকার নেই, নষ্ট না করে আমরা খেতে পারি, তেমন ফল মা ঠাকুরঘর থেকে নিয়ে আসতেন। যারা ঠাকুরঘর করতাম, তাদের দিয়ে বলতেন, ''নাও খেয়ে নাও।'' একদিন লক্ষ্মীদি (শ্রদ্ধাপ্রাণাজী) নিবেদিতা স্কুল থেকে এসেছেন। মা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে হাতমুঠো অবস্থায় লক্ষ্মীদির সঙ্গে কথা বলছেন। লক্ষ্মীদি বললেন, ''হাতে মুঠো করা কী আছে মা? আমাদের দিন।'' মা বললেন, ''তোমরা বাবু লোক। আমার মেয়েরা খাবে।''

ভাষা ও নানা ব্যাপারে সমস্যা নিয়ে মজা করে কবিতা লিখেছিলাম। একদিন আশাদি (মুক্তিপ্রাণাজী) নিবেদিতা স্কুলে গেছেন, রাত্রে থাকবেন। সেই সুযোগে ওইদিন রাত্রে পাঠের আগে আমরা মজার কবিতাগুলো পড়ি। তাই নিয়ে মা ও আমরা সকলে খুব আনন্দ করি। মাকে কিন্তু আগেই বলেছিলাম, ''মা, আশাদি এলে বলবেন না। তবেই কবিতা আপনাকে শোনাব।'' পরদিন আশাদি এলেন। পাঠের আগে বড়োরা যখন কথাবার্তা বলছেন, সেইসময় মা ধীরে ধীরে বললেন, ''জান আশা, কাল পাঠের আগে কবিতা পড়া হল। তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি হল। জয়ন্তী লিখেছে।'' শুনে আশাদি বললেন, ''কই আমি শুনব না?'' মা বললেন, ''না, ও তোমাকে বলতে বারণ করেছে।'' আশাদি বারবার আমাকে ডাকছেন। আমি তো লজ্জায় ভয়ে গেলাম না। রূপালির (প্রেমপ্রাণা) কাছে খাতা ছিল। সে এনে পড়ে শোনাল।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমার রুটিন ছিল বিকেলে আটা মেখে রুটি বেলে দিয়ে ভজনে গিয়ে তবলা বাজানো। ভজনে যেতে দেরি হলে আশাদির বকুনি খেতে হবে। অথচ যিনি রুটি সেঁকতেন সেই রাঁধুনি সুভাষিণীদি রোজ দেরি করে যেতেন। সেদিনও যথারীতি দেরিতে এলেন। আমার তখন রুটি বেলা শেষ। ভজনের ঘণ্টা পড়ে গেল। বললাম, ''সুভাষিণীদি আসি।'' কোনও উত্তর নেই। বারবার আমি বলাতে বিরক্ত হয়ে বললেন, ''থুইয়া যান, থুইয়া যান।'' আমি ভাবলাম, একসঙ্গে অনেক রুটি বেলে রেখেছি, শুকনো হয়ে গেছে। তাই ধুয়ে দিতে বলছেন। বললাম, ''কী করে ধোব?'' তাও উত্তর নেই (কারণ মুখে পান)। তাই বেলা রুটিতে জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে মুছে রেখে ভজনে চলে যাই। ভজন শেষ হতেই রান্নাঘরের দরজা খুলে চিৎকার—''মায়াদি নিচে আইসেন; মায়াদি নিচে আইসেন।'' নিত্যপ্রাণাজী দৌড়ে এলেন। ব্যাপার শুনে তিনি মুখে কাপড় দিয়ে চুপ; হাসতেও পারছেন না, বকতেও পারছেন না। সুভাষিনীদি কিন্তু ক্রোধের স্বরে বললেন, ''খাবার লাইনে কিন্তু আশা মা বকবেন আমাকে। আপনারা কইয়্যা দিবেন জয়ম্‌দিকে ডাকতে।'' নিত্যপ্রাণাজী তখন আমায় বললেন, ''কী করলে বলো।'' আমি সব ব্যাপারটা বললাম : ''বারবার বলা সত্ত্বেও ও একটা কথাই বলছে—থুইয়া যান, থুইয়া যান। তাই আমি ধুয়ে দিয়েছি। শুকিয়ে ছিল তো!'' রাত্রে খাবার আগেই মায়াদি ঘটনাটা আশাদিকে বলেছিলেন। রাত্রে আমার পরিবেশন ছিল। লাইনে পাশাপাশি আশাদি, রেণুদি (মোক্ষপ্রাণামাতাজী), মা, বিজলিদি ও অপর বড়োরা

বসেছেন। আশাদি আমায় বললেন, ''জয়ম্, তোমার কমনসেন্স নেই? রুটি কেউ ধোয়?'' তখন রেণুদি পূর্ববঙ্গের মতো করে বললেন, ''থুইয়া যান মানে রাইখ্যা যান। ও ক্যামনে জানব আশাদি! ও তো ঠিকই করছে।'' খাবার লাইনে হাসির রোল পড়ে গেল।

আমি তখন বাজার করি। মায়ের জন্মদিনের আগে অসিতাপ্রাণা মাকে বলল, ''মা আপনার জন্মদিনে কিছু খাব।'' ''কী খাবে?'' ''কফি।'' মা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বললেন, ''একটা কফির প্যাকেট নিয়ে এসো।'' একটা প্যাকেটের দাম তিন টাকা ছিল। মায়ের কাছ থেকে তিন টাকা নিয়ে বাজারে যাই। গিয়ে দেখি তা তিন টাকা চার আনা। হিসেব দেওয়ার সময় অমৃতপ্রাণাজী বললেন, ''মায়ের কাছে চাইতে হবে না। আমি দিয়ে দেব।'' মা আমায় বললেন, ''তুমি আমার কাছ থেকে পঁচিশ পয়সা নিলে না?'' অমৃতপ্রাণাজী দিয়ে দেবেন বলায় মা বললেন, ''মঠের পয়সা দিয়েছে? স্বামীজী বলেছেন শাকের কড়ি মাছে দেবে না। আমার তো প্রণামির টাকা আছে।'' অমৃতপ্রাণাজী জেনে বললেন, ''না মা, মঠের টাকা দিইনি। আমার কাছে খুচরো পয়সা ছিল, তার থেকে দিয়েছি।''

শ্রদ্ধাপ্রাণাজীর জন্মদিনে মা প্রতিবছর মঠ থেকে কাপড় ও চাদর দিতেন। একবার মায়াদির দেওয়া কাপড় মায়ের পছন্দ হল না। তাই দুপুরে মা নিজের ঘরে গিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় বের করে খাটে রাখছেন আর হাত দিয়ে মেপে বলছেন, ''লম্বা মানুষ, ওর এতটুকু কাপড়ে কি কুলোয়?'' অনেক বাছার পর একটা বড়ো কাপড় আমার হাতে দিয়ে বললেন, ''যাও এটা রং করে আনো।''

ঠাকুরের তিথিপুজোর আগের দিন বিকেলে ঠাকুরের বৈকালি ফল কাটছি। হঠাৎ মা আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ''কাল দিন-রাত তোমার পুজো। যাও, আজ আর ফল কাটতে হবে না।''

গাছের বাইরের দিক থেকে ফুল না তুলে ভিতর ও নিচ থেকে তুলতে বলতেন মা। বলতেন—ঠাকুর ফুল দেখতে ভালোবাসেন, মা-ও বাগানে বেড়াতে যান।

একদিন মায়ের কাছে শুনলাম, ''গোলাপ মা শ্রীশ্রীমাকে বলছেন—সরলা সবসময় কাজ করে। জপ করতে সময় পায় না। শ্রীশ্রীমা বললেন—ওর কিছু করতে লাগবে না।'' তারপর মা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—জপ না করলে কিন্তু কলা পাবে। তারপর জপধ্যানের প্রসঙ্গে দু-চারটে কথা বললেন।

মায়ের সময়ানুবর্তিতা খুব ছিল। কাছে ঘড়ি ছিল না কিন্তু ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে মা চলতেন। কোথাও যেতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগে প্রস্তুত থাকতেন। একদিন বলেছিলাম, ''মা আপনার কাছে আছি, আর সাধনা করতে হবে না।'' মা বললেন, ''ঠাকুরের ছেলেরা তবে এত সাধনা করলেন কেন?'' বলতেন—যত ওঠা বসা করবে শরীর তত ভালো থাকবে। রাত্রে পাঠের পর মা একটা ছড়া বলতেন—

''আড়ি বন্ধ, বাড়ি বন্ধ, বন্ধ চারিদিক,
গোয়ালেতে গোরু বন্ধ, রক্ষা করো শিব।
রক্ষা করো মহাদেব, রক্ষা করো কালী,
তালি তালি তালি।''

এই বলে তিনবার তালি দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতেন।

১৯৭০ সালে আমাকে ত্রিচুরে পাঠানো হয়। এদিকে দিন দিন মায়ের শরীর খারাপ হয়ে আসছে। তাই যাবার সময় মন খুব খারাপ। মাকে বললাম, ''মা, আর আপনাকে দেখতে পাব না।'' মা বললেন, ''ঠাকুর তোমার সেবা নেবেন।'' এক বছর ওখানে ছিলাম। মায়ের শরীর খুব খারাপ শুনে অজয়প্রাণাজী, ধীরাপ্রাণাজী প্লেনে করে এসেছিলেন মাকে দেখতে। মা ওঁদের দেখেই বললেন, ''তোমরা ওকে আনলে না?'' তখন মঠ কর্তৃপক্ষ আমাকে আসতে বলায় কয়েকদিন পর মঠে আসি। ট্রেন চব্বিশ ঘণ্টা লেট ছিল। এসে শুনি মায়ের খুব চিন্তা—স্টেশনে কাউকে পাঠানো হল না; আমি একা কী করে আসব? আশাদি বললেন, ''ও সাব্যস্ত, মা। একা আসতে পারবে।'' আমি আসতেই আশাদি আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ''মা, আপনার মেয়ে এসেছে।'' মায়ের কী আনন্দ! বললেন, ''ঠিক আছে, নেয়ে কিছু খাও। আজ থেকে সাত দিন নাইট ডিউটি-তে থাকবে।''

শেষ সময়েও মা সকলের মঙ্গলকামনা করেছেন। রেখে গেছেন এক আদর্শ ব্রহ্মবাদিনীর জীবন। তাঁকে শতকোটি প্রণাম। ✠